কোহিনুর

দিল্লীতে থাকতে একটা পাঠচক্রে যাওয়া-আসা ছিল। শহরের দূরদূরান্ত থেকে মহিলারা সপ্তাহান্তে একত্রিত হতেন। তবে তাঁরা সবাই যে একান্ত পঠনশীলা তা নয়। অনেকেই আসতেন সময় কাটাতে। ক্লাব-পার্টি, তম্বোলা- নৃত্য-গীতে বিরক্ত হয়ে মুখ বদলাতে। উর্দিপরা ড্রাইভার ঝকঝকে হালফ্যাশানের গাড়ীতে করে পৌঁছে দিয়ে যেতো, আবার সময়মত পাঠচক্রের দরজায় এসে সেলাম ঠুকতো যাত্রাকালে। রাজধানীর ধুরন্ধরদের ঘরনীরা সব। পদে মানে ধনে অনেক উচ্চস্তরের জীব। সেখানেই দেখেছিলাম সরসীদিকে।

পাঠচক্রের সঞ্চালিকা থেকে শুরু করে সাধারণ পাঠিকাবৃন্দ, সকলেই দিদি ডাকতো তাঁকে এবং অনুগত অনুজার বিনয়ে অবনত হ'ত তাঁর কাছে। সহপাঠিনীদের কাছে শুনতাম সরসীদির নাকি গত ক'বছর ধরে আনাগোনা আছে পাঠচক্রে। তবে এ যাবৎ প্রাথমিক-প্রারম্ভিক-প্রবেশ-পরিচয় কোন পরীক্ষাই দিয়ে উঠতে পারেননি। নিয়মিত হাজিরাই গুণে আসছেন কেবল। তবু সরসীদির সেই উপস্থিতিটুকুর মধ্যেই এমন একটা গাম্ভীর্য গমক দমক ছিল যে সমস্ত পাঠচক্র - অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হোমরা চোমরা পাঠিকা সমেত - সম্ভ্রমে তটস্থ হয়ে থাকতো সতত। শুনেছিলাম সরসীদির স্বামী নাকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের কেউকেটা একজন। এছাড়া তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই নাকি মস্ত মস্ত চাকরি নিয়ে যত বড় বড় দপ্তরে বিরাজ করছেন এখানে-ওখানে।

বৎসরান্তে প্রতিবছর পরীক্ষার প্রাক্কালে পাঠচক্রের সহপাঠিনীদের বিদায় ভোজে ডাকতেন সরসীদি। সেই উপলক্ষে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতে পদার্পণের সৌভাগ্য হয়েছিল একবার। বাড়ির নাম কোহিনুর - সার্থকনামা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন ফাইভ-স্টার হোটেল একখানা। ঠিক তেমনি পেল্লায় আয়োজন। উর্দিপরা বেয়ারা খানসামা দারোয়ান।

রাজসিক সমারোহ চারদিকে।

পাঠচক্রে আমাদের মত দু'একজন সাদামাটা শিক্ষার্থীও ছিল। তাদের মধ্যে সুলোচনা নামে একজনের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছিল আমার। পাঠচক্রের বিদ্যামন্দিরের লাগোয়া বাড়ি, দিল্লীতে বহুকালের বাসিন্দা তারা। দিল্লী ছাড়ার পরও তার সঙ্গে পত্রালাপ ছিল। যদিও সাংসারিক ঝামেলায় নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়ে উঠতো না, তবু যোগসূত্র ছিল বহুদিন। সুলোচনা লিখেছিল সরসীদি নাকি তখনো পাঠচক্রের পঠন চালিয়ে যাচ্ছেন অবিচল নিষ্ঠায়। এরপর সুলোচনার চিঠিপত্র আসাও বন্ধ হয়ে গেছে একসময়। তারপর আর খোঁজখবর রাখিনি।

প্রায় এগারো বছর বাদে, গোটা তিনেক স্থান পরিবর্তনের পর, আবার "দিল্লী চলো" হুকুম এলো আমার কর্তার অফিস থেকে। এবার দিল্লীতে আমরা বাড়ি পেলাম একেবারে যমুনা পেরিয়ে। বহুদূরে। দিল্লীতে আসার প্রায় বছর দেড়েক পরের কথা। কি একটা কাজে মোতিবাগ অঞ্চলে গেছিলাম। সুলোচনাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূর নয় জায়গাটা। হঠাৎ ভারি ইচ্ছে হ'ল ওর সঙ্গে দেখা করার। অবশ্য সুলোচনা তখন দিল্লীতে আছে কিনা এবং থাকলেও সেই বাড়িটাতেই আছে নাকি বাড়ি বদল করে অন্য কোথাও উঠে গেছে কিছুই জানি না। তবু ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে দোষ কি !

হলদে দোতালা বাড়ি। নীচের তলায় ঘন্টি বাজাতে অচিরেই সকল শঙ্কা দূর হয়ে গেল। দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো সুলোচনা স্বয়ং। তারপর চা আর পাপড়ভাজা খেতে খেতে এগারো বছর অদর্শনের ব্যবধান কোথায় তলিয়ে গেল। ঘর-সংসার, জীবন ধারণের নানান সমস্যা, মাছ-তরকারীর বাজার দরের সমীক্ষা সেরে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণের মাঝে হঠাৎ মনে পড়লো সরসীদির কথা। প্রশ্ন করতেই সুলোচনা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "যাবে নাকি সরসীদির কাছে?"

থতমত খেয়ে গেলাম। সেই জমজমাট ফাইভ-স্টারের ছবি মানসপটে ভেসে উঠলো। হঠাৎ যখন তখন যাওয়া যায় নাকি সেখানে!

যোগ্য বেশবাস- উপলক্ষ-আমন্ত্রণ ছাড়া!

সুলোচনা বললো, "সরসীদি এখানেই আছে। এই বাড়িটার দোতলায়।"

"তার মানে?" ভারি অবাক হলাম। "মি:বীরেন্দ্রনারায়ণ কি দেহ রেখেছেন অ্যাদ্দিনে? কিন্তু তাঁর সেই আসবাবপত্রে ঠাসা বিশাল অট্টালিকা, দেশে বিদেশে নানান ব্যাঙ্কে বিরাট অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স - সেগুলো তো রেখে যাবার কথা। এই নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ার আধপুরোনো দোতলায় সরসীদি কি করছেন তবে?"

সুলোচনা বললো, "বীরেন্দ্রনারায়ণ মারা যাননি। বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন এখনও। তবে এখানে নেই, আছেন আবুধাবিতে। সরসীদি বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতা করেন। থাকেন দোতলার দু'খানি কুঠরিতে।"

পুরো কাহিনীটা শোনালো সুলোচনা। সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

সরসীদিরা আগে যে পাড়ায় থাকতেন সেটা দিল্লীর অতি বনেদি পাড়া। সরসীদিদের বাড়িটা পাড়ার মধ্যমনি বলতে গেলে। বাড়িটা নিজস্ব, সরকারী নয়। জমি কিনে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়েছিলেন বাড়ি। খাঁটি সুইস ধাঁচে। বাড়ির টাইল, রান্নাঘরের দেয়াল, বাথরুমের কমোড-টমোডগুলো সবই বিদেশ থেকে খুঁজে-পেতে অর্ডার দিয়ে আনানো। বিভিন্ন ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু সেই ঘরের কাঠামো অনুযায়ী বানানো যাতে সারা বাড়িতে এতটুকু তালভঙ্গ না ঘটে কোথাও। যদিও দিল্লীর বাইরে বিভিন্ন শৈলাবাসে, তীর্থস্থানে আরও ক'খানা বাড়ি করেছিলেন বীরেন্দ্রনারায়ণ, এই বাড়িখানার প্রতিই খুব বেশী টান ছিল সরসীদির। কোন সন্তানাদি না থাকলেও আপাতদৃষ্টিতে কোন ফাঁক ছিল না ওঁদের জীবনে। কর্মবীর বীরেন্দ্রনারায়ণ নিজ ক্ষমতা ও পরাক্রমের পরিধি বাড়ানোর নেশায় মেতে থাকতেন অহর্নিশি আর সরসীদি ব্যস্ত থাকতেন বাড়ি-গাড়ি, দাস-দাসী এবং পাঠচক্র নিয়ে।

হেনকালে সেই বিশ্রী ব্যাপারটার সূত্রপাত ঘটলো। দেশের অন্য যে কোন শহরের মত দিল্লীতেও হেন স্থান নেই - তা সে যত সম্ভ্রান্ত যত পশ্ হোক না কেন - যা নাকি রোগ-দারিদ্র্য-অনাহার মাখা ছন্নছাড়া লোকগুলোর আওতার বাইরে। সরসীদির বাড়ির খানিক দূরে গুটিকয় চালাঘরে খান আষ্টেক পরিবারে চল্লিশাধিক প্রাণী কোনমতে মাথা গুঁজে

থাকতো। অর্ধনগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট লোকগুলো পাড়াসুদ্ধু সকলের চক্ষুশূল কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পাড়াচ্যুত করা যায়নি তাদের। অবশেষে মাছি-মশা-ঘেয়ো কুকুর আর নর্দমার পাঁক-কর্দমের মত তাদের উপস্থিতি নিরুপায়ে মেনে নিয়েছে সবাই, বিধির অমোঘ বিধান ভেবে।

সেই চালাঘরেরই ছেলে মেওয়ালাল। গাছতলায় কাঠের মঞ্চে ইস্ত্রি পেতে বসলো কিছুদিন, তারপর ঠেলাগাড়ি নিয়ে ছড়া কেটে কেটে পেয়েরা ফিরি করতে দেখা গেল তাকে। তারপর কোথায় যে উধাও হ'ল সে খবর পাড়ার সাবেক বাসিন্দারা কেউ জানে না। জানার জন্যে মাথাব্যথাও পড়েনি কারও।

এরপর অনেকদিন বাদে প্রকাণ্ড বিদেশী লিমোসিনে চড়ে দামী জমকালো পোশাকের লোকজনের আসা-যাওয়াও কৌতুহল জাগায়নি তাদের মনে। পাড়ার বিরাট একটা পুরোনো বাড়ির হাতবদল ঘটলো। সে বাড়ির লাগোয়া ডাইনে বাঁয়ে অনেকখানি জমি সোনার দামে কিনে নিলো কেউ - ভাসা ভাসা খবরটা কানে এলো অনেকের। তারপর বুলডোজার দিয়ে পুরোনো বাড়ি ভেঙে সমান করে চষে ফেলে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে মহা সমারোহে ভূমিপূজার পর নতুন বাড়ির ভিৎ স্থাপন হ'ল। এর পর হৈ হৈ রবে বাড়ির কাজ এগোতে লাগলো।

হবু বাড়ির আকার-সাকার দেখে সাবেক বাসিন্দাদের চোখ ট্যারা। বাড়ির কোথাও মিনার, কোথাও প্রাকার, কোথাও ইয়া চওড়া ঝুল বারান্দা আর পেল্লায় স্তম্ভের সারি; সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, কাঁচের ঘর জুড়ে প্রকাণ্ড অ্যাকোয়ারিয়াম। এত বড় প্যালেস, এই দেবভোগ্য প্রাসাদখানা তুলছে কে? এই প্রশ্নের জবাব শুনে তাবৎ পাড়া-প্রতিবেশীরা হতভম্ব হয়ে গেল। এ বাড়ির সৃষ্টিকর্তা, মালিক, ওই রঙচঙে পোশাকপরা গগল্‌স্ আঁটা লোকটি, যে আজ পেজো কাল টয়োটা পরদিন মার্সেডিজ চড়ে চক্কর দিয়ে যায় এ পাড়ায়, এ আর কেউ নয় সেই মেওয়ালাল যাকে ক'বছর আগে খালি গায়ে ইজের পরে ঘুরতে দেখেছে সবাই। গাছ তলায় ইস্ত্রিরত অবস্থায়। কিংবা ছড়া কেটে পেয়ারা বিক্রির সময়। সেই মেওয়ালাল আজ টাকার কুমীর। আবুধাবিতে বহু বছর কাজে লেগে থেকে এই রূপান্তর তার।

মেওয়ালালের ওই বাড়িটাই কাল হ'ল সরসীদির। হুড়হুড় করে বাড়ছে বাড়িটা আর সরসীদির আহার-নিদ্রা-মনের শান্তি সব কিছু ঘুচে যাচ্ছে দ্রুত। সেই নতুন বাড়ি তাঁর অত সাধের 'কোহিনুর'কে হেলায় ছাড়িয়ে গেল, তারপরও বেড়েই চললো বাড়িটা। মিনার, ঝুল-বারান্দা, প্রাকার, পোর্টিকো, বড় বড় স্তম্ভের সারি - একটার পর একটা গড়েই চলেছে সমবেত কারিগরেরা আর তাঁর কোহিনুর সকল দীপ্তি, সকল গরিমা হারিয়ে মুখ কালো করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে হতশ্লিষ্ট পরাজিত হয়ে।

এ পরাজয়ের অপমান যে কতখানি বেজেছিল তাঁকে, কি প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল তাঁর গভীর মর্মস্থলে, বাইরের লোকে টের পায়নি গোড়াতে। তাই বীরেন্দ্রনারায়ণের পদত্যাগে দারুণ তুলকামাল বেধে গিয়েছিল সরকারী মহলে। এমন চৌকস বিদগ্ধ কর্মীর কর্মত্যাগের সম্ভাব্য কারণগুলো নিয়ে কাগজে কাগজে লেখালেখি চলেছিল বহুদিন ধরে। এবং এর অল্প কিছুদিন পরে যখন তাঁর আবুধাবি যাত্রার কথা কাগজে বেরুলো, সেদিন আর কোন মন্তব্য শোনা যায়নি এ নিয়ে। খবরটা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেছিল সবাই। তবে বীরেন্দ্রনারায়ণের চেনা মহলে একটা চাপা গুজব চলেছিল যে পুরো ব্যাপারটাতে নাকি তাঁর একেবারেই মত বা হাত ছিল না। সবটাই আগাগোড়া অন্তঃপুরঘটিত। এই বয়সে আবুধাবি অবধি ধাওয়া করতে চাননি তিনি। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেই বাধ্য হয়েছেন শেষতক। সরসীদি নাকি আত্মঘাতী হবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন তাঁকে ----।

এই পর্যন্ত বলে সুলোচনা থামলো। আড়চোখে দেখলো আমায়।

তারপর খালি প্লেট ও কাপ দু'টো হাতে নিয়ে ওঠার উপক্রম করতে আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তারপর?"

"বলছি। আর ক'টা পাঁপর ভেজে আনি, সঙ্গে একটু চা।"

"না, না, আর কিছু লাগবে না," আমি অধৈর্য কন্ঠে বললাম, "সরসীদি জোর করে ভদ্রলোককে পাঠালো কেন?"

"কেন আবার? মেওয়ালালের আকাশছোঁয়া অট্টালিকার পাশে

মিইয়ে গেছে ওঁর অত সাধের কোহিনুর। বীরেন্দ্রনারায়ণ আবুধাবি থেকে কাঁচা টাকা কামিয়ে আনবেন। মেওয়ালালের বাড়িকে লবডঙ্কা দেখিয়ে তরতর করে আরও ক'তলা গজিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে কোহিনুর - এই উচ্চাশায়। বীরেন্দ্রনারায়ণের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। একেবারে ধরে পাকড়ে পাঠালো বলতে গেলে।"

"সরসীদি গেলেন না?"

"কোহিনুর ছেড়ে? নাঃ, সরসীদি এখানেই রয়ে গেলেন। পাঠচক্রে যাওয়া- আসাও অব্যাহত রইলো তাঁর। আমি অবশ্য পাঠচক্র থেকে বেরিয়ে গেছি তখন। তবু মাঝে মাঝে দেখা হ'ত বিদ্যামন্দিরে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি? বীরেন্দ্রনারায়ণ চলে গেলেন। শুনেছি ওখানে গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে চিঠি লিখেছিলেন স্ত্রীকে। নতুন দেশ, কাজকর্মের পরিবেশ, কিছুই নাকি মনঃপুত হয়নি তাঁর। এই বয়সে নতুন করে সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, এভাবে বেশীদিন চললে একেবারে পটোল উত্তোলনও অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। এই সব লিখে দেশে ফিরে আসার অনুমতির জন্যে কাতর অনুনয় জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরসীদিকে টলাতে পারেনি সে চিঠি। সরসীদি বললেন নাথিং ডুয়িং। এরপর আর বীরেন্দ্রনারায়ণের খবর পাওয়া যায়নি বহুদিন। এমনকি সরসীদিও নাকি চিঠিপত্র পাননি আর। তারপর, গেল বছরের আগের বছর খবর এলো।"

সুলোচনা থামলো। ঢোক গিললো।

তারপর গলা নামিয়ে বললো, "কাগজ-টাগজ নিয়মিত পড়ার সময় কোথায় বল? সংসারের কাজ সেরে নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ পাইনে। সেদিন দুপুরের দিকে কাগজখানা খুলে বসেছিলাম। ভিতরের দিকের পাতা। কর্মখালি - হারানোপ্রাপ্তি - পাত্রী চাই'এর পাতাখানা। হঠাৎ ছোট্ট একটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো। বীরেন্দ্রনারায়ণ নামে কেউ আবুধাবি থেকে জানিয়েছে যে এখন থেকে তার নাম মির্জা বদরুদ্দিন।"

"ওমা, সে কি?"

"বিজ্ঞাপনটা পড়ে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। তারপর ভাবলাম ধ্যেৎ, তা কখনো হয় ! এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ। এক নামে আরও তো লোক

থাকতে পারে। এরপর শুনলাম সরসীদি বিদ্যামন্দিরে টিচারের কাজ নিয়েছে। এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে কোহিনুর ছেড়ে। এমন কি কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখেনি। এই দোতলার ঘর দু'খানা আমিই জোগাড় করে দিলাম। এই বয়সে নতুন করে এত খাটা-খাটনি কি কম কষ্ট? অন্ততঃ স্কুলের কাছে বাড়ি হ'লে যাতায়াতের কষ্টটুকু থেকে বাঁচে।"

"আর বীরেন্দ্রনারায়ণ? তাঁরও তো বয়স হয়েছে অনেক? ওখানকার ধকল সহ্য হচ্ছিল না বলে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন নাকি ?"

সুলোচনা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, "সে তো অনেক আগের কথা। খোল-নলচে পালটে এখন একেবারে অন্য মানুষ তিনি। নতুন বিবি-বাচ্চা নিয়ে বহাল তবিয়তে আছেন।"

দরজায় ঘন্টা বাজলো। দ্রুতপায়ে উঠে গেল সুলোচনা।

সরসীদি ছাতাখানা মুড়িয়ে বগলদাবা করে ক্লান্ত গলায় বললেন, "দুধ দিয়ে গেছে তো?"

সুলোচনা বললো, "হ্যাঁ, ফ্রিজে রেখেছি। ভিতরে আসুন না সরসীদি, এক কাপ চা খেয়ে যান।"

সরসীদি বললেন, "না ভাই, এখন আর বসবো না। একগাদা খাতা কারেক্ট করতে হ'বে। দুধটা নিতে এসেছিলাম।"

"আমি নন্তুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অতগুলো খাতা ঘাড়ে করে আবার দুধের ডেকচি নেবেন কি করে?"

"আচ্ছা নন্তুকে দিয়েই পাঠিয়ে দিও তবে।"

সরসীদি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সুলোচনা আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো।

আমি সবেগে ঘাড় নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললাম, "না।"

দেয়ালের ওপাশে সরসীদির ক্লান্ত পদধ্বনি ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগলো ----।